আত’তাবঈন

ফি

হুকমিল উমারা ওয়াস্ সালাতীন

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

بسم الله الرحمن الرحيم

আল-হামদু লিল্লাহ্ ওয়া সল্লাল্লাহু আলা সায়্যেদিনা মুহাম্মাদ আম্মা বা'দ .....

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

আল্লাহ হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে তার রসুলকে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি সেই দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। [সূরা তাওবা/৩৩, সূরা ফাতহ/২৮, সূরা সাফ/৯]

আল্লাহ (ﷻ) এর পক্ষ হতে প্রদত্ত এই দায়িত্বপ্রাপ্তির ঘোষণা দিয়ে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الكُفْرَ

আর আমিই হচ্ছি বিনাশকারী যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরীকে বিনাশ করবেন।

[সহীহ আল বুখারী]

তামাম দুনিয়ার মানুষকে শিরক কুফর ও পাপাচার থেকে

মুক্তি দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদকে পরাভূত ও বিনাশ করার লক্ষেই আল্লাহ (ﷻ) যুগে যুগে নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কেও একই দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল তিনি সে দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ .....

রাসূল (সাঃ) বলেন, আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা স্বাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তার রসুল, আর নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে .....

শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পর এ গুরুদায়িত্ব তার উম্মতের উপর ন্যাস্ত হয়েছে। এই উম্মতের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না সকল প্রকার ফিতনা দূরিভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরুপে আল্লাহর জন্য হয়ে

যায়। [আনফাল/৩৯]

আল্লাহ (ﷻ) আরো বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করো আর মন্দ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখো। [সূরা আলে ইমরান/১১০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে মাওকুফভাবে বর্ণিত আছে,

خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلَامِ

তোমরা মানুষের জন্য সর্বত্তোম বন্ধু যেহেতু তোমরা তাদের গর্দানে শিকল বেধে ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে আসো। [সহীহ বুখারী]

মোট কথা অনবরত যুদ্ধের মাধ্যমে শিরক কুফর ও তার ধারক বাহকদের পরাজিত পরাভূত করে ইসলামকে বিজয়ী করার মহান দায়িত্ব রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উম্মত হিসাবে আমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। যুগে যুগে মুসলিমরা

অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব পালন করে এসেছে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে এবং তার পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদার যুগে তো বটেই এমন কি খলীফায়ে রাশেদার পরবর্তী মুসলিম খলীফা ও সুলতানরা ইসলামের অন্যান্য বিভিন্ন বিধি-বিধানের ব্যাপারে কিছুটা উদাসিনতা প্রদান করলেও জিহাদের বিধানের ব্যাপারে তারা পরিপূর্ণ সজাগ ছিলেন। ফলে বিজয় নিশান পশ্চিমে মিশর থেকে শুরু করে মরোক্ক পর্যন্ত পৌছে যায় শেষে মুসলিমরা তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে সাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনে হাজির হয় এবং স্পেন তাদের হস্তগত হয়। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে প্রাচ্যের খুরাসান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত মুসলিমদের বিজয় অভিযান বিস্তৃত হয়। এর পর রয়েছে সালাহুদ্দিন আয়্যুবির নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ এবং মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এর নেতৃত্বে কুস্তুনতিনিয়া (কনষ্টানটিপল) বিজয়। তাছাড়া নিকট অতীতে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনসমূহ এবং হাল আমলের মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিরোধে ইরাক ও আফগানিস্থানের মুসিলমদের সংগ্রাম ইত্যাদি বহু সংখ্যক সৃতিগাথা কাহিনী।

এসব ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াই করে তার দ্বীনকে বিজয়ী করার যে

দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে তা কখনই পুরোপুরি পরিত্যাগ করেনি। বরং প্রতিটি যুগেই পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশে কেউ না কেউ এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এ বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন,

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থেকে যুদ্ধকরতে থাকবে। [মুসলিম]

সহস্র শতাব্দির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হতে আমরা যে শিক্ষাটি পায় তা হলো, যখনই কাফিররা সরাসরি ইসলামের উপর আঘাত হেনেছে কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ওলামায়ে দ্বীন সাধারন মুসলিমদের তাদের প্রতিরোধ করা এবং তাদের সাথে লড়াই করার দিকে আহ্বান করেছেন ফলে মুসিলমরা কোনোরুপ সংশয় সন্দেহ ছাড়াই একযোগে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে এবং তাদের প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু যখন মুসলিম নামধারী কোনো রাষ্ট্রপ্রধান কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করে বা নিজের অন্তরে অবস্থিত নিফাকী ও কুফরীর প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে ইসলামের উপর আঘাত হেনেছে তখন সাধারন

মুসলিমরা তো বটেই এমনকি বরেণ্য ওলামায়ে কিরামও তাদের ব্যাপারে মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করতে সক্ষম হন নি। এ বিষয়ে বাদশা আকবার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। স্পষ্ট শিরক কুফরে লিপ্ত হওয়া, দ্বীনে ইলাহী নামক নতুন ধর্ম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা, মানুষকে বিভিন্ন হিন্দুয়ানী বিধর্মী কার্যকলাপে অভ্যস্ত করা ও ইসলাম হতে দূরে সরিয়ে নেওয়ার মতো কার্যকলাপ প্রকাশ পাওয়ার পরও আমরা দেখেছি মুসলিমরা তার সাথে একজন কাফির বাদশার মতো কঠোর আচরণ করতে ব্যার্থ হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, বাদশা আকবার যা করেছে যদি কোনো হিন্দু বা খৃষ্টান বংশদ্ভূত বাদশাহ এমনটি করতো তবে ওলামায়ে কিরাম তার বিপরীতে স্পষ্ট ফতোয়া প্রদান করতেন এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের জন্য সাধারণ মুসলিমদের আহ্বান করতেন। কিন্তু আকবারের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? এটা সত্য যে, তৎসময়ের হক্কাণী ওলামায়ে কিরাম তার প্রতিবাদে কলম ও কালাম ব্যবহার করেছেন কিন্তু তৎসময়ের বেশিরভাগ আলেমে দ্বীন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা তাকে পদচ্যুত করে শয়তানের শাসন বিনাশ করার প্রচেষ্টা করেন নি। সাধারণ মুসলিমদের এদিকে আহ্বানও করেন নি। যদিও এটা নিশ্চিত যে, হিন্দু বা খৃষ্টান বংশদ্ভুত কোনো কাফিরের

তুলনায় আকবার বড় কাফির ছিল। যেহেতু সকল ওলামায়ে কিরাম ইজমা করেছেন যে, জন্মগত কাফিরের তুলনায় মুসিলম হওয়ার পর যে কাফির হয়ে যায় তথা মুরতাদ বেশি নিকৃষ্ট। ইমাম নাব্বী মুরতাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

هي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً

এটা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রকারের কুফরী এবং এর বিধানও সর্বাপেক্ষা কঠিন।

[আর-রাওদা]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন,

وَكُفْرُ الرِّدَّةِ أَغْلَظُ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ

এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, মুসলিম হওয়ার পর কাফির হয়ে যাওয়া জন্ম থেকে কাফির থাকার তুলনায় নিকৃষ্ট। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এটা হলো হক্কানী ওলামায়ে কিরামের ফাতাওয়া কিন্তু আমরা আকবারের মতো বড় মুরতাদের সাথেও কঠোর আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। উল্টো দেখা যায় কিছু নির্বোধ প্রকৃতির ইসলামী চিন্তাবিদ আকবারকে ইসলামের মহান মনীষি হিসাবে উপস্থাপণের চেষ্টা করে এবং আকবারের

হিন্দু প্রীতিকে ইসলামের অসাম্প্রদায়িক নীতিমালার প্রমাণ সরুপ উপস্থাপণ করে গর্ব করে থাকে।

মুরতাদ শাসকদের প্রতি এ ধরণের নমনীয় আচরণ আমরা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখতে পায়। আমরা দেখেছি আফাগানিস্থানে রাশিয়ার নাস্তিকরা আক্রমণ করলে সারা বিশ্বের মুসলিম তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলিমরা আফগানিস্থানে গমণ করত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয় এবং তাদের পরাজিত করে ছাড়ে। কিন্তু রাশিয়ার মদদপুষ্ট কমিউনিষ্টপন্থী নাস্তিক শাসক সাদ্দাম হোসেন [1] বা জামাল আব্দুন নাসেরের ব্যাপারে মুসলিম উম্মা যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কাফির হিসাবে ঘোষণা করা বা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করিনি। সাধারন মানুষের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা ও সমর্থনের অভাবে

---

[1] সাদ্দাম হোসেন মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে থাকলে সে কথা ভিন্ন কিন্তু যখন সে শাসক ছিল তখন সে মুরতাদই ছিল। ইসলামের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার তাচ্ছিল্য তামাশা বা ইসলামকে হেয় করার কারণে শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম তাকে স্পষ্ট কাফির হিসাবে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে তিনি সুরা তাওবার তাফসীর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমরা সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালে তার প্রতি মুসলিম উম্মাহর উদাসীনতা নিয়েই আলোচনা করছি। তার জীবনের মৃত্যুর আগ মূহুর্তের শেষ সময়টুকু নিয়ে নয়।

মুজাহিদরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার বিপরীতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় নি। অথচ যখনই সাদ্দামের শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত করে সরাসরি মার্কিন কাফিররা ইরাক দখল করল আমরা দেখলাম সাধারণ মানুষ মুজাহিদদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসলো ফলে মুজাহিদরা তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পেলো এবং কুফরী শক্তি পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করল। বর্তমানে আফগানিস্থানে মার্কিন আগ্রাসনের বিপরীতে যে জিহাদ চলছে কিছু সংখ্যক বিবেকভ্রষ্ট লোক ছাড়া সারা বিশ্বের হক পন্থী ওলামায়ে কিরাম সেটাকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হিসাবেই জানে। ওলামায়ে কিরামের এধরণের স্পষ্ট সমর্থন ও পক্ষালম্বনের কারণে আফগানিস্থানের সাধারণ মুসলিমরাও ব্যপকভাবে মুজাহিদদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সেখানে আল্লাহর ইচ্ছায় কাফিররা আবারও পরাজয়ের দারপ্রান্তে পৌছে গেছে। এটাও সম্ভবত একারণে যে, সরাসরি কাফিররা আফগানিস্থান অধিকার করে রয়েছে। যদি মুসলিম নামধারী কোনো মুরতাদ আফগানিস্থানের রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করে থাকতো তবে সেখানকার অবস্থা হয়তো ভিন্নরকম হতো।

মোট কথা যুগে যুগে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে মুসলিম নামধারী রাষ্ট্রপ্রধানরা সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে কাজ

করেছে। যেহেতু তাদের ব্যাপারে সাধারন মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক দূর্বলতা কাজ করে ফলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ সংঘঠিত করা দূরহ হয়ে পড়ে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় কাফিরদের নিকট এ দূর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে তাই তো আমরা দেখি কাফিরা এখন সরাসরি মুসলিম ভূখন্ড দখল করার পরিবর্তে মুসলিম নামধারী শাসকদের বশ করে তাদের মাধ্যমে ইসলামকে ধ্বংসের যাবতীয় ব্যাবস্থা চুড়ান্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ওলামায়ে দ্বীনের অসাবধানতা এবং সাধারন মুসলিমদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এই সকল মুসলিম নামধারী শাসকরা নিজেদের মুসলিম পরিচয়কে ব্যবহার করে অনেকটা বাধাহীনভাবে মুসলিমদের দেশে কাফিরদের প্রাদেশিক গভর্নর বা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করে যায়। বিশেষভাবে ফলদায়ক হওয়ার কারণে বর্তমানে কাফিররা ব্যপকভাবে এই কৌশল ব্যবহার করছে। এমনকি যেসকল স্থানে কাফিররা সেনা অভিযান প্রেরণ করে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানেও মুসলিম নামধারী পুতুল শাসককে ঢাল হিসাবে সামনে রেখে সাধারণ মুসলিমদের প্রতারিত করার প্রচেষ্টা করে। ইরাক ও আফগানিস্থানে আমরা যেমনটি দেখেছি। এ পদ্ধতিতে তাদের আম ছালা উভয়ই রক্ষা হয়।

এখন চিন্তার বিষয় হলো, এই সমস্যাটি কিভাবে অতিক্রম করা যায়। এ লক্ষে আমাদের প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে সাধারণ মুসলিমরা কাফির শাসকের তুলনায় মুসলিম নামধারী ইসলাম বিদ্বেষী শাসকের প্রতি নমনীয় আচরণ করে কেন? সামান্য চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই যে সত্যটি স্পষ্ট প্রতিভাত হবে তা হলো, সাধারণ মুসলিমরা এবং বর্তমান যুগের ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে পরিচিত অধিকাংশ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ঈমান ও ইসলামের স্বরুপ ও ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে অবগত নয়। তারা কেবল জন্মগতভাবে বা কালেমা পাঠ করে একবার ইসলাম গ্রহণের পর একজন ব্যক্তিকে সারাজীবনের জন্য মুসলিম হিসাবে গণ্য করে থাকেন। যত বড় স্পষ্ট কুফর বা শিরকেই সে লিপ্ত হোক তাতে তার ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় বলে তারা মনে করেন না। ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে সুবিস্তারে না জানার কারণেই মূলত মুসলিম নামধারী সকল শাসকদের মুসলিম শাসক হিসাবে গণ্য করে তাদের সাথে নমনীয় আচরণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ঐ সকল হাদীস জোরে সোরে বর্ণনা করা হয় যেখানে বলা হয়েছে মুসলিম শাসকদের মধ্যে অপন্দনীয় বা অপ্রিতীকর কিছু লক্ষ করার পরও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিৎ নয় বরং তাদের আনুগত্য করে যেতে হবে। এসকল

শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রসঙ্গ উঠলেই এক শ্রেণীর লোক বলে ওঠে, জিহাদ তো কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে আবার কিসের জিহাদ! সুতরাং দুটি মাসয়ালা সম্পর্কে সঠিক রায় অবগত হলে এ সমস্যার সহজ সামাধান করা সম্ভবপর।

ক) বর্তমানে মুসলিম দেশ সমূহের উপর যেসব মুসলিমনামধারী শাসক কর্তৃত্ব করছে এবং আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত আইনকে দেশের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করছে আর ইয়াহুদী-খৃষ্টান চক্রের গোলাম হয়ে ইসলামকে ধ্বংস করার নীল নকশা বাস্তাবায়নের ষড়যন্ত্র করছে ইসলামী মানদন্ডে এরা কি আদৌ মুসলিম হিসাবে গণ্য?

খ) জিহাদ কি কেবলমাত্র কাফিরের বিরুদ্ধে নাকি কখনও কখনও পাপাচার বদকার বা ফাসিক মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধেও জিহাদ করা বৈধ হয়?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে আমরা বলবো, ঈমান ভঙ্গের বহু সংখ্যক কারণ রয়েছে যার কোনো একটি একজন মুসলিমের মধ্যে দেখা গেলে সে তৎক্ষনাৎ কাফিরে পরিনত হবে। যদি কোনো মুসলিম শাসক এ ধরণের কুফরীতে লিপ্ত হয় তবে তাকে পদচ্যুত করা ফরজ হবে। রসুলুল্লাহ

(ﷺ) সাহাবায়ের নিকট ওয়াদা গ্রহণ করতেন যে,

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

শাসকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরী দেখা যায় যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে। [বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম নাব্বী কাজী ইয়াদ থেকে বর্ণনা করেন,

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ

ওলামায়ে কিরাম ইজমা করেছেন যে, কোনো কাফিরকে শাসক হিসাবে মনোনিত করা যাবে না আর যদি কোনো (মুসলিম) শাসকের মধ্যে পরবর্তীতে কুফরী পাওয়া যায় তবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। [শারহে মুসিলম]

এখন দেখার বিষয় হলো বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহের যেসব শাসকবৃন্দকে ঢালাওভাবে মুসলিম হিসাবে সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম ঘোষণা করা হচ্ছে তাদের ঈমান আদৌ অক্ষত আছে কিনা। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ঈমান ভঙ্গের বহু সংখ্যক কারণ

রয়েছে। ফুকাহায়ে কিরাম তাদের গ্রন্থাবলীতে হুকমুল মুরতাদ প্রসঙ্গে সেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা সেগুলোর মধ্যে কেবল বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

প্রথমতঃ কুরআন হাদীস ও ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত তথা ইজমার মাধ্যমে সম্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, আল্লাহ (سبحانه وتعالى) কর্তৃক প্রদত্ত সকল হুকুম আহকাম অকপটে স্বীকার না করা পর্যন্ত একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে গণ্য হতে পারে না। আল্লাহ (عز وجل) বলেন,

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]

আহলে কিতাবীদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তার রসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম হিসাবে স্বীকার করেনা এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিজিয়া প্রদান করে। [সূরা তাওবা/২৯]

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به

আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো যতক্ষণ না তারা স্বাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমার উপর আর আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করে। [সহীহ মুসিলম]

সুতরাং আল্লাহ তার রসূলের উপর যেসব বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো সম্পূর্ণরুপে স্বীকার না করা পর্যন্ত একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে গণ্য হতে পারে না। যদি কেউ কুরআনের কোনো একটি বিধানকে অস্বীকার বা অপছন্দ করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কাজী ইয়াদ বলেন,

وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه

যদি কেউ কুরআনকে বা কুরআনের একটি হরফকেও অস্বীকার ও অপছন্দ করে সে কাফির হবে। [আশ-শিফা]

একারণে ওলামায়ে কিরাম কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফির বলে থাকেন। যদিও তারা কুরআনের সকল বিষয়ে ঈমান রাখে। এমনকি তারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে শ্রেষ্ঠ নবী মনে করে। কিন্তু তারা কুরআনের একটি আয়াতের একটি শব্দ না মানার কারণে তাদের কাফির বলা হয়। সূরা

আহযাবের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন (وخاتم النبيين) "তিনি শেষ নবী"। কাদেয়ানী সম্প্রদায় এই কথাটি না মানার কারণে সমস্ত মুসলিমের নিকট বেঈমান হিসাবে পরিচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কাদেয়ানী সম্প্রদায়ের মতো যারাই কুরআনের কোনো একটি বিধান বা কোনো একটি নির্দেশকে অস্বীকার করে তাদের ঈমান অক্ষুণ্য থাকতে পারে না।

ইবলীসের চির অভিসপ্ত হওয়ার কারণও মূলত এই যে, সে আল্লাহর আদেশের উপর আপত্তি করে বলে, "আমি তো আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" একথার মাধ্যমে সে মুলত বোঝাতে চেয়েছে আমাকে আদমের উদ্দেশ্যে সাজদা করতে আদেশ করাটা ইনসাফ হয়নি। কেবল মাত্র আল্লাহর (ﷻ) এর একটি আদেশকে অযৌক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করার কারণে সে কাফির হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং তার সকল আমল বিনষ্ট হয়েছে।

উপরোক্ত দলীল প্রমাণের আলোকে ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো, "হালালকে হারাম মনে করা বা হারামকে হালাল মনে করা স্পষ্ট কুফরী"

মোল্লা আলী ক্বারী বলেন,

أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية

কোনো গোনাকে বৈধ মনে করা কুফরী সেটা কবীরা হোক আর সগীরা হোক যদি সেটা গোনা হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত দলীলের মাধ্যমে প্রমানিত হয়। [শারহে ফিকহে আকবার]

বর্তমান যুগের যেসব শাসককে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে তাদের বেশিরভাগই কুরআন-সুন্নাকে দেশের সংবিধান তথা সর্বোচ্চ আইন হিসাবে স্বীকার করে না বরং বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের বিপরীত আইন প্রনয়ন করে। এদের একটা কৌশল হলো এরা সরাসরি একথা বলে না যে, "আমরা অমুক হারাম বিষয়টিকে হালাল মনে করি বা অমুক হালাল বিষয়টিকে হারাম মনে করি।" এভাবে সরাসরি হালাল-হারাম শব্দ প্রয়োগ না করে তারা ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে। তারা বলে, মানবরচিত সংবিধানই এদেশের সর্বোচ্চ আইন এর বিপরীতে অন্য যে কোনো আইন এই সংবিধানের সাথে যতটুকু অসামঞ্জস্য হবে ততটুকু পরিত্যাগ করা হবে। তারা হালাল হারাম শব্দের পরিবর্তে আইন-বেআইন এই সকল শব্দ প্রয়োগ করে থাকে। তাদের এই কৌশলের বিপরীতে আমাদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের বিধি-বিধান নির্দিষ্ট একটি শব্দের সাথে

সংশ্লিষ্ট নয় বরং মূলভাব প্রকাশ পায় এমন প্রত্যেকটি শব্দের বিধান একই হবে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে আমি তোমাকে বাদ দিলাম বা ডিভোর্স দিলাম তবে আরবীতে তালাক শব্দটি উচ্চারণ না করা সত্ত্বেও তার স্ত্রীর উপর তালাক প্রযোজ্য হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল মদ পান করবে। তারা মদকে ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করবে। [আবু দাউদ]

আদ-দারেমীতে অতিরিক্ত এসেছে, (فيستحلونها) এভাবে তারা মদকে হালাল হিসাবে গণ্য করবে।

সুতরাং মূল বিষয়বস্তু একই হলে কেবল নাম পরিবর্তন করলে বা ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করলেই কোনো বিষয়ের বিধান পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। আমরা যদি বাংলা ভাষায় 'আইন' শব্দটির প্রয়োগের দিকে লক্ষ করি তবে দেখবো কেবলমাত্র বৈধ, উত্তম বা যথাপোযুক্ত বিষয়কেই আইন বলা হয়ে থাকে। যখন কোনো শাসক কোনো আইন প্রনয়ন করে তখন সে উক্ত আইনটিকে যথার্থ ও যথাপোযুক্ত দাবী করে এবং সেটার কার্যকারিতা প্রমানের জন্য স্বচেষ্ট হয়। সুতরাং কোনো কিছুকে আইন বলে

ঘোষনা করার স্পষ্ট অর্থ হলো সেটিকে উত্তম বা বৈধ হিসাবে ঘোষণা করা। যারা ইসলামের বিপরীত আইন প্রনয়ন করে বা হারাম কাজকে আইনী বৈধতা দেয় তারা কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। মানব রচিত সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসাবে ঘোষণা দেওয়াটাও একই পর্যায়ের বা তদাপেক্ষা বড় কুফরী। যেহেতু এ ধরণের ঘোষণায় একই সাথে বহু সংখ্যক অনৈসলামিক বিষয়াবলীকে আইনসিদ্ধ করা হয়।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? ইমানদারদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে? [সূরা মায়েদা/৫০]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন,

وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه،

فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله

জাহেলী বিধান সমুহের মধ্যে ঐসব বিধানও গণ্য তাতাররা যার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়াদির ফয়সালা করতো যা তারা তাদের নেতা চেঙ্গিস খান হতে গ্রহন করেছিল যে তাদের জন্য ইয়াসিক নামে একটি সংবিধান রচনা করে দিয়েছিল যা সে ইয়াহুদী খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান হতে কিছু কিছু গ্রহণ করার মাধ্যমে রচনা করেছিল তাতে এমন কিছু বিষয়ও ছিল যা তার নিজের মত। পরে এটাই তার বংশধরদের মধ্যে আমলযোগ্য বিধানে পরিনত হয় তারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিধানকে পিছনে ঠেলে উক্ত বিধানের মাধ্যমে বিচার করতো তাদের মধ্যে যে কেউই এমনটি করবে সে কাফির হবে তার সাথে জিহাদ করা ফরজ হবে যতক্ষন না সে আল্লাহর বিধান ও তার রসূলের বিধানের দিকে ফিরে আসে।

[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রঃ) বলেন,

الحاكم الذي يشرع بغير ما أنزل الله هذا غير مسلم خارج من الملة;

لأنه كالذي يغير الصلاة.المقنن الذي قنن القوانين ووضعها, صاغها في قوالب, هذا كافر كذلك خارج من الملة, قد يكون يصلي ويصوم, لكنه كافر .....القضاة الذين ينفذون القوانين: هؤلاء لا يخرجون من الإسلام, لأنهم ينفذون, لا يشتركون في التشريع وإنما في التنفيذ, لكن القاضي الذي عنده أي قوانين يحكم بغير ما أنزل الله آثم بسبب أنه يتعاطى الحرام, راتبه حرام, وظيفته حرام, لا فرق بينه وبين الذي يبيع الخمر في الخمارة

(১) যে শাসক আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রনয়ন করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে যেমন যদি কেউ সলাত পরিবর্তন করে (অর্থাৎ তিন রাকাত সলাত চার রাকাত বা দুই রাকাত পড়তে বলে)

(২) যে আইন রচয়িতা আইন রচনা করে তা বিভিন্ন ধারাই বিভক্ত করে সেও কাফির হবে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে যদিও সে সলাত পড়ে সওম পালন করে কিন্তু সে কাফির।

(৩) যেসব বিচারক বা জজরা আইন প্রয়োগ করে তারা কাফির হবে না কারন তারা আইন বাস্ত

বায়ন করছে মাত্র আইন প্রনয়নে অংশগ্রহন করছে না তবে যে জজ আল্লাহর আইন ভিন্ন অন্য কোনো আইন দ্বারা বিচার করে সে পাপী কারণ সে হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছে তার সাথে রাস্তার একজন মদ বিক্রেতার কোনো পার্থক্য নেই। [সূরা তাওবার তাফসীর]

মোট কথা আল্লাহর আইনের বিপরীত বিচার ফয়সালা করার মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি কাফির হবে না তবে তার এ কাজ হারাম হবে এবং তার উপার্জন হারাম হবে। একইভাবে হারাম কাজের আদেশ প্রদান করা বা হারাম কাজের অনুমতি প্রদান করাও কুফরী হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যাভিচারের আদেশ বা অনুমতি প্রদান করার মাধ্যমে টাকা উপার্জন করে তবে সে মাহাপাপী হবে, কাফির হবে না। কিন্তু হারাম কাজকে আইন হিসাবে গ্রহণ করা কুফরী হবে যেহেতু আইন অর্থ হলো উত্তম, বৈধ অবশ্যপালনীয় ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে মুসলিম নামধারী শাসকদের একটি বিরাট অংশ ধর্মনিরোপেক্ষতা, গণতন্ত্র বা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নামে ভিন্ন ধর্মের লোকদের কুফরী কাজকর্মসমূহকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সমর্থন করে থাকে। পূজা-অর্চনার সময় বিধর্মীদের উপাসনালয়ে গমণ করে তাদের আচার-

অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, এর উপলক্ষে তাদের সাথে উপহার আদান প্রদান করা বা তাদের অভিভাদন জানানো এমনকি তাদের ধর্মীয় গুরুর সামনে মাথা নত করার মতো ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই সাথে নিজেদের জনসভা বা আলোচনাসভাতে আল-কুরআনের পাশাপশি ভিন্ন ধর্মালম্বীদের গ্রন্থ পাঠ করিয়ে থাকে। এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের নিকট স্বীকৃত সিদ্ধান্ত হলো,

الرضي بالكفر كفر

কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করাও কুফরী। [তাফসীরে কুরতুবী ও অন্যান্য]

কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা বলতে বোঝায় তাদের আচার অনুষ্ঠান ও পুজা-অর্চনাতে উপস্থিত হয়ে উল্লাস প্রকাশ করা বা নিজেকে তাদের মধ্যে মিশিয়ে ফেলা। ওলামায়ে কিরাম এবিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফতোয়া উল্লেখ করেছেন।

হানাফী মাযহাবের ফিকাহ গ্রন্থসমূহতে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

لو أن رجلا عبد خمسين سنة ثم أهدي لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله

যদি কোনো ব্যক্তি ৫০ বছর ইবাদত করে এর পর নওরোজের দিন (মাজুসীদের উৎসবের দিন) কোনো মুশরিককে একটি ডিম উপহার দেয়। যদি সে উক্ত দিনের সম্মানের কারণে এমনটি করে তবে সে কাফির হবে এবং তার সকল ইবাদত নষ্ট হবে। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুখতার ইত্যাদি]

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে কি কাজ করলে একজন ব্যক্তি কাফির হয় সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وبخروجه إلى نيروز المجوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما

এবং (কোনো মুসিলম কাফির হবে) যদি সে মাজুসীদের ধর্মীয় উৎসবের দিন তাদের সাথে গমণ করে এবং তারা ঐদিন যা করে তা করে অথবা ঐ দিনের সম্মানে এমন কিছু ক্রয় করে যা সে পূর্বে ক্রয় করতো না।

কাজী ইয়াদ বলেন,

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعى إلى الكنائس والبيع

مع أهلها والتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤس فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام

আমরা এমন প্রত্যেক ব্যাক্তিকে কাফির বলব যে এমন কাজ করে যে কাজের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা যে, তার কেবলমাত্র কাফিরের মাধ্যমেই হতে পারে যদিও উক্ত ব্যাক্তি উক্ত কাজ করার পরও প্রকাশ্যে ইসলাম পালন করে যেমন মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, ক্রুশ ইত্যাদিকে সাজদা করা, **ইয়াহুদী বা খৃষ্টানদের সাথে তাদের উপাসনালয়ে গমন করা তাদের পোশাক পরিধান করা খৃষ্টানদের ফিতা গলায় পরা এবং তাদের অনুসরনে মাথার চুল পাখির বাসার মতো জাড়ানো ইত্যাদি**। কেননা মুসলিমরা ইজমা করেছেন যে এসব কাজ কেবল একজন কাফিরই করতে পারে এবং এসব কাজ কুফরীর আলামত যদিও এসব কাজে লিপ্ত ব্যাক্তি প্রকাশ্যে ইসলামের অনুসরণ করে। [আশ শিফা]

সুতরাং যেসকল মুসলিম নামধারী ধর্মনিরোপেক্ষ শাসক, পরমত সহিষ্ণুতা ও অসাম্প্রদায়িকতার মূলমন্ত্রে দিক্ষীত হয়ে কাফির-মুশরিকদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তাদের সাধুবাদ জানিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে বা তাদের ধর্মীয়

উপসনালয়ে গমণ করে ও তাদের উপহার প্রদান করে তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত। একথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, তারা হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মীয় লোকের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে বা হিন্দু মুসলিম সকলে এদেশের নাগরিক। তারা এখানে কর দিয়ে বাস করে অতএব সকলের প্রতি সমান আচরণ করা শাসকদের কর্তব্য। যারা এধরণের যুক্তি উপস্থাপণ করে তারা আসলে ইসলামের মূলমন্ত্র সম্পর্কে অবহিত নয়। যে কাজ সাধারণ মুসলিমদের জন্য হারাম বা কুফরী শাসক শ্রেণীর জন্য সে কাজ বৈধ ইসলাম এমন বিধান দেয় না। জনগনের ভোট গ্রহণ করে পাশ করলেই কেউ আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতে পারে না তার জন্য কোনো পাপ কাজ বৈধও হয়ে যায় না। আর কর দেওয়ার বিষয়ে কথা হলো কর দিলেই মুসলিম রাষ্ট্র ও একজন মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান হিন্দু খৃষ্টানদের কাছে বিক্রি হয়ে যাবে না। হিন্দু-খৃষ্টানদের নিকট ভোট গ্রহণ করলে বা কর গ্রহণ করলেই রাষ্ট্র প্রধানের জন্য শিরক-কুফরে লিপ্ত হওয়া বৈধ হয়ে যাবে না। আমার মনে হয় এ বিষয়টি যারা ইসলামের অ-আ, ক-খ সম্পর্কে অবগত তারাও বুঝতে সক্ষম হবেন। শুধু এতটুকু স্মরণ রাখাই যথেষ্ট হবে যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগেও ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম জিম্মীরা কর

প্রদাণ করে বসবাস করতো। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ও খুলাফায়ে রাশেদা তাদের সাথে যে আচরণ করেছেন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের সাথে তেমন আচরণই করতে হবে। বিধর্মীদের উৎসবের দিনে তাদের অভিবাদন জানানো বা তাদের উপসনালয়ে গমণ করে তাদের আচার-অনুষ্ঠান অবলকন করা বা তাতে অংশ গ্রহণ করা কি কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় হতে পারে!

তৃতীয়তঃ কুফর-তাকফিরের ব্যাপারে আর একটি স্বীকৃত মূলনীতি হলো, (تمني الكفر كفر) "কুফরী কাজের প্রত্যাশা করা কুফরী" যদি কেউ নিজে কুফরী করে না কিন্তু অন্য কাউকে কুফরী করতে বলে, অন্য কাউকে কুফরী কাজে উৎসাহ দেয় বা কুফরী করতে বাধ্য করে তবে সে এই মূলনীতির আলোকে কাফির হিসাবে গণ্য হবে। একইভাবে কোনো কাফিরকে তার ধর্মীয় বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া। তাদের নিজ নিজ ধর্মের উপর টিকে থাকার উপদেশ দেওয়া। এসবই কুফরী হিসাবে গণ্য।

ইমাম নাব্বী বলেন,

والرضي بالكفر كفر حتي لو سأله كافر يريد الاسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل أو أشار عليه بأن لا يسلم أو علي مسلم بأن يرتد

فهو كافر

কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী এমনকি যদি কোনো কাফির মুসলিম হতে চায় এবং কোনো মুসলিমের নিকট এসে কালিমা পাঠ করাতে অনুরোধ করে আর উক্ত মুসলিম তা না করে বা তাকে ইশারা ইঙ্গিতে মুসলিম না হতে পরামর্শ দেয় বা কোনো মুসলিমকে কাফির হওয়ার ইঙ্গিত দেয় তবে উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে। [আর-রাওদা]

বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে,

ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو علي وجه اللعب وبأمره امرأة بالارتداد والافتاء بذالك وإن لم تكفر المرأة

কুফরী কালিমা যে পাঠ করতে চায় তাকে তা শিক্ষা দিলে একজন মুসলিম কাফির হবে। যদিও এটা হাসি তামাশার ছলে হয়। একইভাবে যদি কেই কোনো মহিলাকে স্বামীর নিকট হতে তালাক পাওয়ার কৌশল হিসাবে কুফরী করার পরামর্শ দেয় বা কোনো মুফতি এমন ফতোয়া দেয় তবে উক্ত মহিলা কুফরী না করলেও উক্ত মুফতি কাফির হবে।

মোট কথা কোনো কাফির বা কোনো মুসলিমকে কুফরী কথা বা কাজ করতে বললে বা করতে বাধ্য করলে সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তি কাফির হিসাবে গণ্য হবে।

বর্তমানে মুসলিম নামধারী রাষ্ট্রপ্রধানরা এমন অনেক কাজ করে থাকে যা এই পর্যায়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। উদহারণ স্বরুপ, অনেক সময় দেখা যায় রাষ্ট্রে কোনো মহামান্য (!) ব্যক্তি অসুস্থ হলে বা মারা গেলে প্রধান মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি সকল ধর্মের লোকদের তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রার্থণা করার অনুরোধ জানান। এধরণের আহ্বানে একদিকে যেমন ভিন্ন ধর্মালম্বীদের উপাস্যসমূহকে সুস্থতা দান করার বা কল্যাণ করার ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হচ্ছে ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এখানে কাফিরদের তাদের উপাস্যদের নিকট প্রার্থণা করার মতো স্পষ্ট কুফরী কাজের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে উভয় দিক থেকে বিষয়টি কুফরী। একইভাবে বিভিন্ন জনসমাবেশে বা আলোচনা সভায় আল-কুরআনের পাশা-পাশি পাদ্রী-পুরোহিত বা ভিক্ষু ডেকে বিধর্মীদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করানোটিও এই পর্যায়ের কুফরী কাজ বলে গণ্য। উক্ত ধর্ম গ্রন্থের যে অংশটি পাঠ করা হচ্ছে তার মধ্যে যদি স্পষ্ট কুফরী থাকে যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো স্রষ্টায় বিশ্বাস বা এই জাতীয় কিছু তবে তো এটা কুফরী হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট এমন কি যদি পাঠকৃত অংশটিতে এ ধরণের স্পষ্ট কুফরী কথা-বার্তা নাও থাকে তবু একজন

মুসলিমের জন্য অন্য কোনো বিধর্মীকে ডেকে এনে তার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করানো কুফরী হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু এতে তার ধর্ম ও ধর্ম গ্রন্থকে সম্মান করা হয় তাছাড়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা যে কোনো ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বা উপাসনা হিসাবে গন্য। অতএব কোনো কাফিরকে তার স্বীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে বলা অর্থ তাকে কিছু সময়ের জন্য হলেও তার স্বীয় ধর্ম পালন করা এবং নিজ উপাস্যদের উপাসনা করার দিকে আহ্বান করা আর কোনো কাফিরকে তার নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহিত করা বা সেদিকে আহ্বান করা কুফরী।

কাউকে কুফরী কাজের উপর টিকে থাকা বা কুফরীর দিকে ইশারা ইঙ্গিতে হলেও আহ্বান করা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম ভীষণ কড়াকড়ি করেছেন। হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থে এ বিষয়ক বেশ কিছু ফতোয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

মোল্লাহ আলী ক্বারী আল হানাফী বলেন,

وفي الفتاوي الصغري اسلم كافر فقال له مسلم لو لم تسلم حتي ترفع ميراثا أي تأخذه كفر أي المسلم القائل

ফতোয়ায়ে সুগরাতে আছে একজন কাফির মুসলিম হলে

অন্য একজন মুসলিম তাকে বলল তুমি যদি মিরাছের সম্পদ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। যে মুসলিম একথা বলল সে কাফির হবে। [শারহে ফিকহে আকবার/২৭২]

ইমাম নাব্বী আর-রাওদাতে হানাফী ওলামায়ে কিরাম থেকে উল্লেখ করেন,

قالوا ولو قال كافر لمسلم اعرض علي الاسلام فقال حتي أري أو اصبر إلي الغد أو طلب عرض الاسلام من واعظ فقال اجلس إلي آخر المجلس كفر

তারা [হানাফী আলেমরা] বলেন, যদি কোনো কাফির কোনো মুসলিমকে বলে আমাকে ইসলামের দীক্ষা দেন আর সে বলে আমাকে একটু চিন্তা করার সুযোগ দিন বা আগামী কাল পর্যন্ত সবর করুন। অথবা কোনো কাফির যদি কোনো বক্তার মজলিসে উপস্থিত হয়ে বলে ইসলামের দীক্ষা চায় আর উক্ত বক্তা বলে সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন তবে সে কাফির হবে।

ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এই ফতোয়াটি উল্লেখের পর বলেন,

لانه امر بالبقاء في الكفر ساعة

কেননা সে কিছু সময়ের জন্য হলেও উক্ত কাফিরকে

কুফরীর উপর টিকে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

চিন্তার বিষয় হলো, একজন কাফিরকে কিছু সময়ের জন্য কুফরী অবস্থায় টিকে থাকার পরামর্শ দেওয়া যদি কুফরী হয় তবে তাকে ডেকে এনে কুফরী ধর্মের গ্রন্থ পাঠ করতে বলা বা মন্দিরে যেয়ে পার্থনা করতে আহ্বান করাটা কেমন হবে?

চতুর্থতঃ আরো একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, কুফরী কাজে কাউকে সহযোগিতা করা কুফরী। কোনো কাফিরকে কুফরী কালাম শিক্ষা দেওয়া বা কাফিরদের উপাসনালয় নির্মান করার ব্যাপারে সহোযোগিতা করা এ পর্যায়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে আমরা বাহরুর রায়েকের রেফারেন্সে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে,

ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو علي وجه اللعب

কুফরী কালিমা যে পাঠ করতে চায় তাকে তা শিক্ষা দিলে একজন মুসলিম কাফির হবে। যদিও এটা হাসি তামাশার ছলে হয়।

রুদ্দুল মুহতারে ইমাম কারাফী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে,

لَا يُعَادُ مَا انْهَدَمَ مِنْ الْكَنَائِسِ ، وَلَكِنَّ سَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ

راضٍ بِالْكُفْرِ وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ

যে সকল গীর্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেগুলো পুননির্মাণ করা যাবে না। সে ব্যক্তি ওগুলো পুননির্মানে সহযোগিতা করবে সে কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করছে বলে গণ্য হবে আর কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী।

বর্তমানে মুসলিম শাসকদের দেখা যায় সকল ধর্মের লোকদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বিধর্মীদের ধর্মীয় পুস্তকাদি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধায়নে লিখন ও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এভাবে মুসলিম নামধারী শাসকেরা রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফর-শিরকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে যা স্পষ্ট কুফরী। একইভাবে মসজিদের মতোই গুরুত্ব দিয়ে বিধর্মীদের ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এভাবে পূজা-উপাসনা ও শিরক-কুফরের আড্ডাখানা নির্মাণ করে কুফরীতে সহযোগিতা করা হয়। এসবই স্পষ্ট কুফরী হিসাবে গণ্য।

পঞ্চমতঃ আল্লাহর দ্বীন নিয়ে তামাশা করা বা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করা স্পষ্ট কুফরী। আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

আপনি বলুন তোমারা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত এবং তার রসূলকে নিয়ে তামাশা করছিলে? তোমারা কোনো ওযর পেশ করো না তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছো। [সূরা তাওবা/৬৬]

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কুটুক্তি করে তবে ঐ সকল বড় বড় কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো। [তাওবা/১২]

এই সকল দলিল প্রমাণের উপর নির্ভর করে ওলামায়ে কিরামের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো,

والاستهزاء بشئ من الشرائع كفر

যে কোনো দ্বীনী বিষয় নিয়ে তামাশা করা কুফরী। [দুররুল মুখতার]

ফতোয়ায়ে তাতার খানিয়া ও মোল্লা আলী কারীর শারহে ফিকহে আকবারে বর্ণিত আছে, ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন সর্বোচ্চ কাজি ছিলেন তখন একবার তার মজলিসে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, রসুলুল্লাহ

(ﷺ) লাউ খেতে পছন্দ করেন। এ কথা শুনে একজন ব্যক্তি বলে আমি লাউ খাওয়া পছন্দ করি না। আবু ইউসুফ (রঃ) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমাকে তরবারী দাও। অবস্থা বেগতিক দেখে লোকটি তওবা করে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শানে বেয়াদবী করার কারণে ইমাম আবু ইউসুফ লোকটিকে মুরতাদ হিসাবে মৃত্যুদন্ড দিতে চাচ্ছিলেন।

কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখি মুসলিম নামধারী শাসকরা ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান নিয়ে তামাশা-তাচ্ছিল্ল করে থাকে। ইসলামের আইন-কানুনকে মধ্যযুগীয় আইন বা বর্বর আইন ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে থাকে। যারা ইসলামী আইন চাই তাদের উদ্দেশ্যে এসব শয়তানদের দোসররা বলে থাকে এরা তো মধ্যযুগীয় বর্বর আইন চায়। এধরনের একটি কথায় একজন মুসলিমকে কাফিরে পরিনত করার জন্য যথেষ্ট।

ষষ্ঠতঃ কুফরী কাজের প্রসংশা করা কুফরী। ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে এসেছে,

وبتحسين أمر الكفار اتفاقا

কাফিরদের কার্যকলাপসমূহকে উত্তম আখ্যায়িত করলে

সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হবে।

এর উদাহরণ হিসাবে মোল্লাহ আলী কারী শারহে ফিকহে আকবারে বর্ণনা করেন,

وفي مجمع النوازل اجتمع المجوس يوم النوروز فقال مسلم سيرة حسنة وضعوا كفي أي لأنه استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحة سيرة الاسلام

মাজমায়ে নাওয়াঝেলে আছে যদি মাজুসীরা তাদের ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য একত্রিত হয় আর একজন মুসলিম এটা দেখে বলে এরা খুবই সুন্দর কাজ করছে তবে এই মুসলিম কাফির হবে। কেননা এতে কুফরী কাজকে উত্তম বলা হচ্ছে সেই সাথে ইসলামকে ছোট করা হচ্ছে।

তথাকথিত মুসলিম শাসকদের প্রায়ই দেখা যায় বিধর্মীদের বিভিন্ন পূজা-অর্চনা বা ধর্মীয় উৎসবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের কার্যকলাপকে প্রসংশা করে বাণী প্রকাশ করে থাকে। কখনও কখনও তাদের উপাসনালয়ে গমণ করে তাদের কার্যকলাপকে বিভিন্নভাবে প্রসংশা করে থাকে। তাছাড়া একথা তো তারা প্রায়ই বলে থাকে যে, সব ধর্মই ভাল কথা বলে। সব ধর্মই সত্য পথ দেখায় ইত্যাদি। এসব কথা স্পষ্টতই কুফরী।

উপরোক্ত কারণ সমূহ যে মুসলিম শাসকের মধ্যে পাওয়া যায় তার ঈমান অবশিষ্ট থাকতে পারে না। অতএব তার ব্যাপারে মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা আবশ্যক।

এখন আমরা দ্বিতীয় মাসয়ালাটির দিকে মনোনিবেশ করতে পারি। আর তা হলো যদি কোনো মুসলিম শাসক ব্যাপক পাপাচারী বা স্পষ্ট ফাসিক হয় এবং তার মধ্যে কোনো স্পষ্ট কুফরী পাওয়া না যায় বা অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাকে কাফির বলা সম্ভব না হয় তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ হবে কিনা। এ বিষয়ে সাধারনত একটি ভূল ধারণা প্রচার করা হয় যে, মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে কখনও কোনো অবস্থায়ই বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। এবিষয়ে দলিল হিসাবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ঐ হাদিসটি উল্লেখ করা হয় যেখানে বলা হয়েছে, স্পষ্ট কুফরী না দেখা পর্যন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। বেশিরভাগ আলোচকই এ বিষয়ে কেবল এই হাদীসটি উল্লেখ করে থেমে যান। ভিন্ন অর্থের হাদীসগুলো এবং সেই আলোকে ওলামায়ে দ্বীনের মতামত বর্ণনা করেন না। অন্য হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিকৃষ্ট শাসকদের বর্ণনা দিলে সাহাবারা বললেন, (أفلا نقاتلهم) আমরা কি তাদের সথে

যুদ্ধ করবো না? রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (لا ما صلوا) "না যতদিন তারা সলাত আদায় করে" অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) "যতদিন তারা সলাত কায়েম করে।" [মুসলিম]

অন্য একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

আমীরের কথা শোনো ও মানো যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব প্রতিষ্ঠা করে। [তিরমিযী, শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন]

এই সকল হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কিরাম সলাত এবং সলাতের মতো গুরুত্বপূর্ন বিষয়াবলী পরিত্যাগ করলে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায় বলে মনে করেছেন। ইমাম নাব্বী হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন,

أَنَّه لَا يَجُوز الْخُرُوج عَلَى الْخُلَفَاءِ بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام

খলীফার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জুলুম বা পাপাচারের কারণে বিদ্রোহ করা যাবে না। যতক্ষণ না তারা ইসলামের বড়

বড় বিষয়গুলোতে পরিবর্তন ঘটায়। [শারহে মুসলিম]

ইমাম নাব্বী ক্বাদী ইয়াদ থেকে বর্ণনা করেন,

فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ

যদি শাসকের মধ্যে কুফরী বা শরীয়তে পরিবর্তন সাধন বা বিদয়াত পাওয়া যায় তবে সে শাসনকার্যের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তার আনুগত্য বাতিল হয় এবং মুসলিমদের উপর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ফরজ হয়। [শারহে মুসলিম]

ইমাম কুরতুবী সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খলীফাকে কখন পদচ্যুত করা যায় সে সম্পর্কে দুটি মতের কথা উল্লেখ করেছেন। একদল আলেম বলেছেন খলীফার মধ্যে কোনো ফিসক পাওয়া গেলে মুসলিমদের উপর তাকে পদচ্যুত করা এবং তার স্থানে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা আবশ্যক হয়। অন্য একদল আলেম বলেছেন যে কোনো প্রকার পাপাচার পরিলক্ষিত হলেই শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয় এমনটি নয় তবে কুফর, সলাত কায়েম করা বা সলাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা পরিত্যাগ করা, শরীয়তের কোনো অংশ পরিবর্তন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাকে পদচ্যুত করতে হবে।

[তাফসীরে কুরতুবী]

এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সমন্বয় ও ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে বলা যায়,

ক) খলীফা কাফিরে পরিনত হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

খ) খলীফা যদি স্পষ্টভাবে কাফিরে পরিনত না হয় কিন্তু ইসলামের বড় বড় বিষয় পরিত্যাগ করে, শরীয়ত পরিবর্তন করে, সাধারন মুসলিমদের মাঝে পাপের প্রচার প্রসার করে। মানুষকে বিভিন্ন শিরকী ও বিদয়াতী আক্বীদা বিশ্বাস শিক্ষা দেয়। মোট কথা তার পাপ কাজের ক্ষতি ও ভয়াবহতা কেবল তার নিজের মধ্যে স্বীমাবদ্ধ না থাকে বরং সমগ্র মুসলিম উম্মার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং কার্যকলাপের মধ্যে ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র অনুভব করা যায়। তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মাঝে উল্লেখযোগ্য কোনো দ্বিমত পাওয়া যায় না। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী "যতদিন তারা সলাত কায়েম করে" এবং "যতদিন তারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করে" এসব হাদীসে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

গ) যদি খলীফার পাপাচার কেবল তার নিজের মধ্যে এবং

তার সাথে সংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে স্বীমাবদ্ধ থাকে। সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য দ্বীন রক্ষা করে চলার পরিবেশ বজায় থাকে এবং কাফির শত্রুদের হাত হতে মুসলিমদের জান-মাল নিরাপদ থাকে। সেই ক্ষেত্রে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ কিনা তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম বিদ্রোহ না করার পক্ষে। কিন্তু কোনোরুপ ফিতনা-ফাসাদের আসঙ্কা ছাড়াই যদি এধরণের ফাসিককে নেতৃত্ব থেকে সরানো যায় তবে বহু সংখক হক পন্থী ওলামায়ে কিরামের নিকট তা বৈধ হবে। কিন্তু ব্যাপক ফিতনা ফাসাদের আসঙ্কা থাকলে এধরণের খলীফাকে পদচ্যুত করার জন্য বিদ্রোহ করা বৈধ নয় কেননা সে ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে আমরা বলতে পারি, বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নামধারী শাসকদের একটি বিরাট অংশ যদি স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত নাও হয় বা কোনো কুফরীতে লিপ্ত হয়েও অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে তাদের কাফির বলা না যায় তবু ও বিভিন্ন হাদীসের সমন্বিত বক্তব্য ও ওলামায়ে কিরামের তাত্তিক বিশ্লেষণের আলোকে আমরা বলতে পারি এসকল শাসকরা মুসলিমদের নিকট কোনোরুপ আনুগত্যের দাবী করতে পারে না। কেননা

ইসলামের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই যা এরা পরিত্যাগ করেনি। সত্য কথা হলো এরা কেবল ইসলামকে পরিত্যাগ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি বরং উল্টো ইসলামকে ধরা পৃষ্ঠ হতে বিনাশ করার নিমিত্তে যারা কাজ করছে এবং মুসলিমদের ঈমান আক্বীদাকে বিনষ্ট করার জন্য সদা পরিশ্রম করে চলতে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা ও সমর্থন যুগানোর মতো ভয়াবহ কাজে লিপ্ত। বিভিন্ন নাম ও পরিচয়ের এন,জি,ও ও অন্যান্য বিদেশী সংস্থার লোকদের মুসলিমদের দেশে ইচ্ছানুযায়ী বিচরণের সুযোগ দেওয়া এমনকি খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ দেওয়া স্পষ্টভাষী নাস্তিকদের নিরাপত্তা বিধান করার মতো ইসলাম বিদ্বেষী কাজে তারা জড়িত। এতো কিছুর পরও যারা এসকল ধর্মদ্রোহী শাসকদের ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ শাসক মনে করে, এদের আনুগত্য করা মুসলিমদের উপর ফরজ মনে করে বা এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ মনে করে তারা চেতনাহীন একদল নির্বোধ চিন্তাবিদ ছাড়া কিছু নয়।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্য বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক এনায়েত করুন। আমীন।